

বাংলাদেশে আধুনিক প্রযুক্তির বিটি বেগুনের জাত উদ্ভাবন ও উৎপাদন প্রযুক্তি

পটভূমি :

বেগুন অত্যন্ত সুস্বাদু উচ্চ খাদ্যমান সমৃদ্ধ সবজি যা সারা বছর পাওয়া যায়। এই সবজিটি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা, যা প্রধান শত্রু পোকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আমাদের কৃষকেরা বেগুন উৎপাদনে উক্ত শত্রু পোকা দমনের জন্য এক মৌসুমে ১৬০-১৮০ বার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কীটনাশক প্রয়োগ করার পরেও কাজিত ফল লাভ করতে সক্ষম হচ্ছেনা। ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে অন্যদিকে ফসল উৎপাদনের খরচও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে। কাজিত জাত উদ্ভাবনে চিরায়িত প্রজনন পদ্ধতির (Conventional) সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য পৃথিবীব্যাপী বর্তমানে জীব প্রযুক্তি (Biotechnology) প্রয়োগ করা হচ্ছে। USAID এর অর্থায়নে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় এর কারিগরী সহায়তায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ABSPII প্রকল্পের মাধ্যমে বায়োটেকনোলজিস্ট, উদ্ভিদ প্রজননবিদ, মৃত্তিকা বিজ্ঞানী, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব ও কীটতত্ত্ববিদদের নিয়ে একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারী টিম গঠন করে বিটি বেগুনের উপর গবেষণা করে। চিরায়িত প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব না হওয়ায়, উন্নত বিশ্বে আবিষ্কৃত কাজিত বৈশিষ্ট্যের জিন (Cry1Ac) বাংলাদেশী নয়টি স্থানীয় জাতে (উত্তরা, কাজলা, নয়নতারা, সিংনাথ, চেগা, ইসলামপুরী, দোহাজারী ও ISD006) সংযোজন করে Bt বেগুন নামে ৯টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিবেশ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে এবং বায়োসেফটি নিয়ম অনুসরণ করে বিগত পাঁচ বছর যাবত দেশের ৭টি স্থানে (জয়দেবপুর, জামালপুর, যশোহর, হাটহাজারী, বরিশাল, ঈশ্বরদী ও রংপুর) বিটি বেগুনের উপর বহুস্থানিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে। প্রাপ্ত ফলাফল সরেজমিনে দেখানোর জন্য স্থানীয় কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি ও গবেষকদের নিয়ে মাঠদিবস আয়োজন করা হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিএআরআই এর বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবছর মাঠ দিবসের সচিত্র প্রতিবেদন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। Cry1Ac জীন সমৃদ্ধ বিটি বেগুনের খাদ্যমান এবং রাসায়নিক উপাদানসমূহ দেশী বিদেশী উন্নত গবেষণাগারে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এতে

মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন উপাদান পাওয়া যায়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের ১০টিরও বেশী এক্সিডিয়েটেড ল্যাবরেটরীতে মাছ, মুরগি, ছাগল, খরগোশ, ইঁদুর, মহিষসহ বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের উপর বিটি বেগুনের কোন ক্ষতিকর (Toxic) প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। উহার প্রেক্ষিতে সকল প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বিটি বেগুনের ৪টি জাত অবমুক্ত করা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর ২৮টি দেশে প্রায় ১৭০.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে GM ফসলের চাষাবাদ হচ্ছে এবং দিন দিন এর আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিন কৌশল প্রয়োগ করে বিভিন্ন দেশে যেসব ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে তার মধ্যে সয়াবিন, ভুট্টা, তুলা, পেঁপে, আলু, সুগারবিট প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য। আমেরিকাতে (২০১২) প্রায় ৬৯.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে GM ভুট্টা, তুলা, সয়াবিন, আলু, স্কোয়াশ, পেঁপে ও সুগারবিটের আবাদ হয়। আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে GM ভুট্টা, তুলা ও সয়াবিন এর আবাদ হয়। একইভাবে কানাডাতে কেনোলা, সয়াবিন, ভুট্টা ও সুগারবিটের এবং চীনে তুলা, পেঁপে, টমেটোসহ বিভিন্ন GM ফসলের আবাদ হচ্ছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে যেখানে GM ফসলের অধীনে জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ১.৭ মিলিয়ন হেক্টর, ২০১২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭০.৩ মিলিয়ন হেক্টর হয়েছে। বিটি বেগুন অবমুক্ত করার ফলে বাংলাদেশ জিএম ফসল চাষে ২৯তম দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। অবমুক্ত বিটি বেগুনের প্রধান সুবিধা হলো, বেগুনের প্রধান শত্রু ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ থেকে বেগুনকে রক্ষা করে। উদ্ভাবিত বিটি বেগুন এর জাত সমূহ হাইব্রিড না হওয়ায় কৃষকরা নিজেদের বীজ নিজেরাই উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারবে। কোন একক বীজ কোম্পানীর কাছে প্রতি বছর বীজ কেনার জন্য দারস্থ হতে হবে না, কীটনাশক ব্যবহার সীমিত হওয়ায় পরিবেশ দূষণ কম হবে, কৃষকের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সর্বোপরি কৃষক তাদের কাস্থিত উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

জলবায়ু ও মাটি :

আমাদের দেশের সব রকমের মাটিতে বেগুন চাষ করা যায় এবং ভাল ফলনও দিয়ে থাকে। তবে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক। বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটিই এর চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। বেগুনের জন্য ১৫° থেকে ২০° সে. তাপমাত্রা সবচেয়ে উপযোগী। উচ্চ তাপমাত্রায় বেগুনের ফুল ও ফল উৎপাদন বিঘ্নিত হয় এবং এসময় অনিষ্টকারী পোকা বিশেষকরে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ বেশী হয়।

জাত :

বারি বিটি বেগুন-১ (উত্তরা), বারি বিটি বেগুন-২ (কাজলা), বারি বিটি বেগুন-৩ (নয়নতারা) ও বারি বিটি বেগুন-৪ (ISD006) নামের চারটি জাত চাষী পর্যায়ে চাষের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। নিম্নে জাত সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দয়া হলোঃ



বারি বিটি বেগুন-১ (উত্তরা)
BARI Bt Begun 1



বারি বিটি বেগুন-২ (কাজলা)
BARI Bt Begun 2



বারি বিটি বেগুন-৩ (নয়নতারা)
BARI Bt Begun 3



বারি বিটি বেগুন-৪
(ISD006)BARI Bt Begun 4

বৈশিষ্ট্যাবলী	বারি বিটি বেগুন-১ (উত্তরা)	বারি বিটি বেগুন-২ (কাজলা)	বারি বিটি বেগুন-৩ (নয়নতারা)	বারি বিটি বেগুন-৪ (ISD006)
গাছের বৃদ্ধির ধরণ	ছড়ানো	ছড়ানো	মধ্যম খাড়া	মধ্যম খাড়া
গাছের উচ্চতা (সেমি)	৭০-৮০	৬৫-৭৫	১১০-১২০	১০০-১১০
ফল ধরার ধরণ	গুচ্ছাকারে	গুচ্ছাকারে	একক	একক
ফলের বুটার রং	বাদামী	বাদামী	সবুজাভ বাদামী	বাদামী
ফলের আকার আকৃতি	Elliptical	সিলিন্ডারাকৃতি	গোল	ডিম্বাকৃতি
ফলের রং	গোলাপী	কালচে-বেগুনী	কালচে-বেগুনী	সবুজ
প্রতি ফলের গড় ওজন (গ্রাম):	৬০-৭০	৭৫-৮৫	১২০-১৩০	২০০-২৩০
হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	৫০-৫৫	৪৫-৫০	৪০-৪৫	৩৫-৪০

জীবনকাল : জাত ভেদে ১৫০-১৮৩ দিন।

চারার উৎপাদন পদ্ধতি :

শীতকালীন চাষের জন্য শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ বপন করা যায়। বেগুন চাষের জন্য চারা উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের দেশে চাষীভায়েরা সাধারণতঃ বীজ সরাসরি বীজতলায় বপন করেন, দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করেন না। এতে বীজের পরিমাণ বেশী লাগে উপরন্তু চারার স্বাস্থ্য ভাল হয় না। প্রথমে বীজতলায় ঘন করে বীজ ফেলতে হয়। বীজ গজানোর ১০-১২ দিন পর গজানো চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করতে হয়। এতে চারা সুস্থ ও সবল হয় এবং ফলন ভাল হয়। বীজতলায় মাটি সমপরিমাণ বালি, কমপোস্ট ও মাটি মিশিয়ে বুর বুরে করে তৈরী করতে হয়। প্রতি হেক্টরের জন্য ১০০-১৩৫ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন :

বীজতলায় সারি করে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়, তবে সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৪ সে.মি.) কাঠি বা টাইন দিয়ে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ছোট বীজের বেলায় বীজের দ্বিগুন পরিমাণ শুকনো ও পরিষ্কার বালু বা মিহি মাটি বীজের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজ বপন করতে হয়। শুকনা মাটিতে বীজ বপন করে সেচ দেয়া উচিত নয়, এতে মাটিতে চটা বেঁধে চারা গজাতে ও বাতাস চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। যে সমস্ত বীজের আবরণ শক্ত, সহজে পানি গ্রব্ধণ করেনা, সেগুলোকে সাধারনতঃ বোনার পূর্বে ভিজিয়ে নেয়া হয়।



সারি করে বীজতলায় বীজ বপন



সারি করে বীজতলায় বীজ বপন

বীজতলায় আচ্ছাদন :

আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বীজতলার উপরে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে যেন বৃষ্টির পানি ও অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে বীজতলাকে রক্ষা করা যায়। আচ্ছাদন বিভিন্ন ভাবে করা যায়। তবে কম খরচে বাঁশের ফালি করে বীজতলার প্রস্থ বরাবর ৫০ সে. মি. পরপর পুতে নৌকার ছৈ এর আকারে বৃষ্টির সময় পলিথিন দিয়ে এবং প্রখর রোদে চাটাই দিয়ে রক্ষা করা



চিত্রঃ বীজ তলায় আচ্ছাদন

চারার যত্ন :

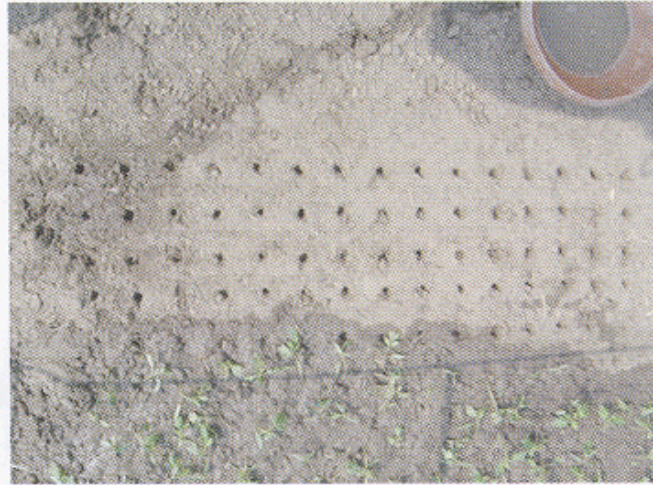
চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দ্বারা অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন। পানি সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যা তবে বীজতলার মাটি দীর্ঘ সময় বেশী ভেজা থাকলে অঙ্কুরিত চারার রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। চারার শেকড় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে রোদ কোন ক্ষতি করতে পারে না, তখন এটি বরং উপকারী। চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর বীজতলায় প্রয়োজন মত দূরত্ব ও পরিমাণ চারা রেখে অতিরিক্ত চারাগুলি যত্ন সহকারে উঠিয়ে দ্বিতীয় বীজতলায় সারি করে রোপণ করলে মূল্যবান বীজের সাশ্রয় হবে।

দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তরকরণ :

জমিতে চারা লাগানোর পূর্বে মূল বীজতলা থেকে তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় সবুজি চারা রোপণের পদ্ধতি অনেক দেশেই চালু আছে। এ পদ্ধতিকে দ্বিতীয় সবুজির চারা স্থানান্তরকরণ পদ্ধতি বলে। দেখা গেছে ১০-১২ দিনের চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করা হলে কপি গোত্রের সবুজি ও টমেটো চারার শিকড় বিস্তৃত ও শক্ত হয়, চারা অধিক সবল ও তেজী হয়। চারা উঠানোর আগে বীজতলায় পানি দিয়ে এরপর সুচালো কাঠি দিয়ে শিকড়সহ চারা উঠাতে হয়। উঠানো চারা সাথে সাথে দ্বিতীয় বীজতলায় লাগাতে হয়। বাঁশের সুচালো কাঠি বা কাঠের তৈরি সুচালো ফ্রেম দ্বারা সবু গর্ত করে চারা গাছ লাগানো হয়। লাগানোর পর হালকা পানি দিতে হবে এবং বৃষ্টির পানি ও ভত্তগষ রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন বা চাটাই দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।



দ্বিতীয় বীজ তলায় স্থানান্তর যোগ্য চারা



দ্বিতীয় বীজ তলায় স্থানান্তর

বীজতলায় চারার রোগ দমন :

বীজতলায় বপনকৃত বীজ গজানোর পূর্বে বীজ এবং পরে কচি চারা রোগাক্রান্ত হতে পারে। অঙ্কুরোদগমরত বীজ আক্রান্ত হলে তা থেকে আদৌ চারা গজায় না। গজানোর পর রোগের আক্রমণ হলে চারার কাণ্ড মাটি সংলগ্ন স্থানে পচে গিয়ে নেতিয়ে পড়ে। একটু বড় হওয়ার পর আক্রান্ত হলে চারা সাধারণত মরে না, কিন্তু এদের শেকড় দুর্বল হয়ে যায়। চারা এভাবে নষ্ট হওয়াকে বলে ডেম্পিং-অফ। বিভিন্ন ছত্রাক এর জন্য দায়ী। ড্যাম্পিং অফ রোগ বাংলাদেশে চারা উৎপাদনের এক বড় সমস্যা। বীজতলার মাটি সব সময় ভেজা থাকলে এবং মাটিতে বাতাস চলাচলের ব্যাঘাত হলে এ রোগ বেশী হয়। এ জন্য বীজতলার মাটি সুনিষ্কাশিত রাখা রোগ দমনের প্রধান উপায়।

প্রতিষেধক হিসেবে মাটিতে ক্যাপটান, কপার অক্সিক্লোরাইড বা ডায়থেন এম-৪৫ ১-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলার মাটি ভালকরে ভিজিয়ে কয়েকদিন পর বীজ বপন করতে হবে।

চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা বর্ধন :

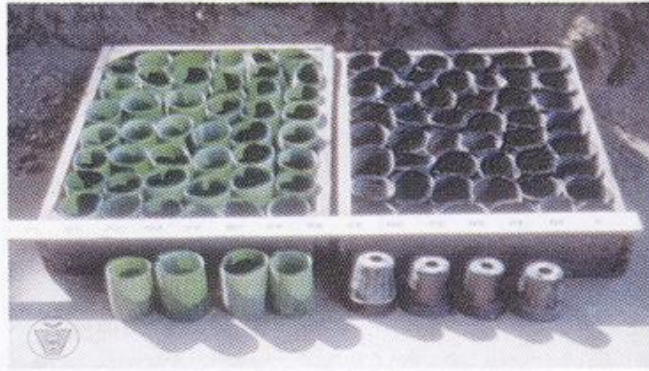
রোপণের পর মাঠের প্রতিকূল পরিবেশ যেমন ঠান্ডা আবহাওয়া বা উচ্চতাপমাত্রা, পানির স্বল্পতা, গুরু বাতাস এবং রোপণের ধকল ও রোপণকালীন সময়ে চারা নাড়াচারায় সৃষ্ট ক্ষত ইত্যাদি যাতে সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারে সেজন্য বীজতলায় থাকাকালীন চারাকে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা হয়। যে কোন উপায়ে চারার বৃদ্ধি সাময়িক ভাবে কমিয়ে যেমন বীজতলায় ক্রমান্বয়ে পানি সেচের পরিমাণ কমিয়ে বা দুই সেচের মাঝে সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে চারাকে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা যায়। কষ্ট সহিষ্ণুতা বর্ধনকালে চারার শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট) জমা হয় এবং রোপণের পর এই শ্বেতসার দ্রুত নূতন শিকড় উৎপাদনে সহায়তা করে। ফলে সহজেই চারা রোপণ জনিত আঘাত সয়ে উঠতে পারে।

চারা উৎপাদনের বিকল্প পদ্ধতি :

প্রতিকূল আবহাওয়ায় বীজতলায় চারা উৎপাদনের জন্য বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে সব্জির চারা কাঠের বা প্লাস্টিকের ট্রে, পলিথিনের ব্যাগে, মাটির টবে, গামলায়, থালায়, কলার খোলে উৎপাদন করা যায়। কোন কোন সময় কুমড়া, সীম জাতীয় সব্জির চারা রোপণ করা প্রয়োজন দেখা যায় কিন্তু এসব সব্জি রোপণ জনিত আঘাত সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। ছোট আকারের পলিথিনের ব্যাগে বা উপরে উল্লিখিত অন্যান্য মাধ্যমে এদের চারা উৎপাদন করা উচিত যাতে শেকড় ও মাটি সহ চারা রোপণ করা যায়।



বিকল্প পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন



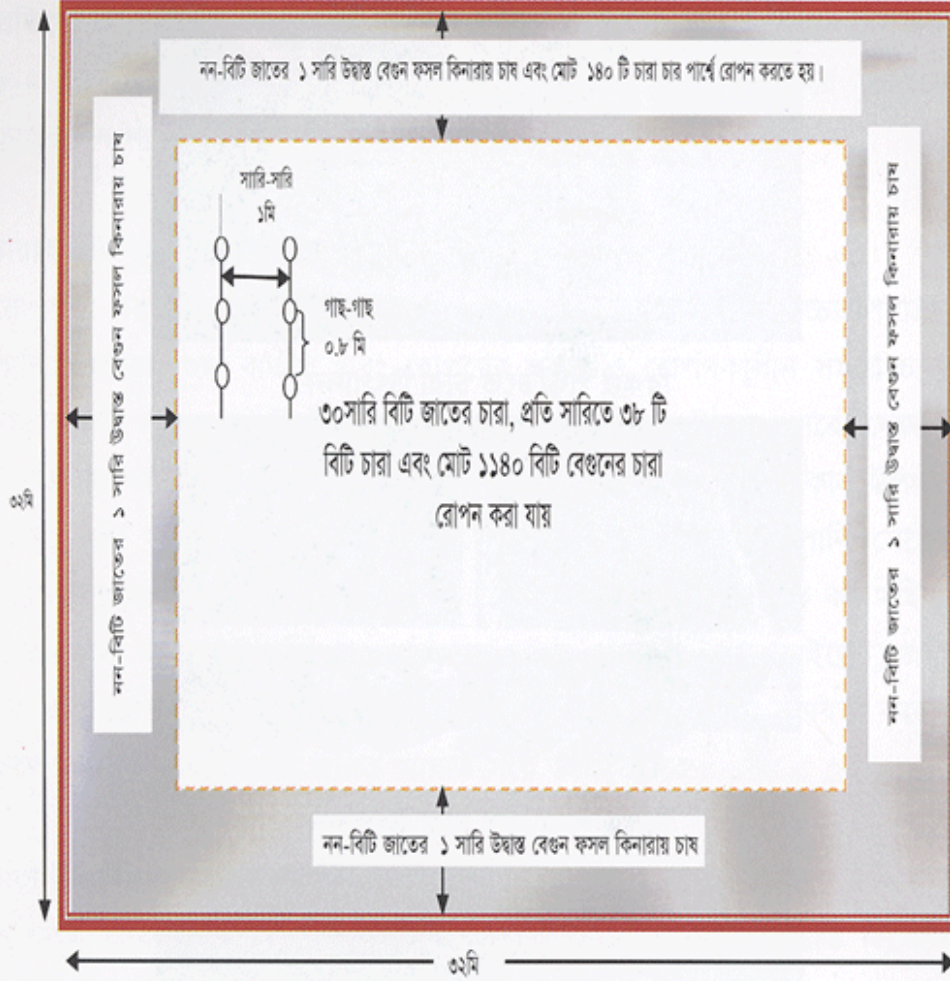
বিকল্প পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন



বিকল্প পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন

বিটি বেগুন চাষকৃত জমির মানচিত্র :

বিটি বেগুন চাষ অন্য সাধারণ বেগুন চাষের ন্যায়। তবে বিটি বেগুন চাষের জমি চার পার্শ্বে $1/2$ সারি সাধারণ বেগুন এর চারা উদ্বাস্ত ফসল হিসেবে রোপন করতে হয়। নিম্নে প্রায় ১ বিঘা জমিতে বিটি বেগুন চাষের নমুনা মানচিত্র দেয়া হলো।



জমি তৈরী :

জমি ৪-৫টি চাষ দিয়ে এমন ভাবে জমি তৈরী করতে হয় যাতে জমিতে মাটির ঢেলা না থাকে বেড়ে চারা রোপনই উত্তম।

বেডের আকার	প্রস্থ	: ৭০ সে.মি.
	দৈর্ঘ্য	: জমির দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করবে
দূরত্ব		: ১০০×৮০ সে.মি.
নালায় আকার	প্রস্থ	: ৩০ সে.মি.
গভীরতা		: ২০ সে.মি.

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (কেজি/হেঃ) :

বেগুন এমন একটি ফসল সার প্রয়োগ ব্যতীত যার সন্তোষজনক উৎপাদন চিন্তা করা যায় না। মাটি থেকে ইহা প্রচুর পরিমাণ খাদ্যোপাদান শোষণ করে। বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্যের অভাব হলে গাছ দ্রুত বাড়ে না এবং পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের স্বল্পতা ফলনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই বেগুন চাষের জন্য হেক্টর প্রতি নিম্নোক্ত পরিমাণ সার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

সার	পরিমাণ	শেষ চাষের সময় দেয়	১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
গোবর/কম্পোস্ট	১০-১৫ টন	গব	-	-	-
ইউরিয়া	৩০০ কেজি	-	১০০ কেজি	১০০ কেজি	১০০ কেজি
টিএসপি	১০০ কেজি	গব	-	-	-
এমপি	২০০ কেজি	গব	-	-	-

* ১ম কিস্তি চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন পর, ২য় কিস্তি ফল ধরা আরম্ভ হলে এবং ৩য় কিস্তি ফল আহরণের মাঝামাঝি সময় দিতে হবে।

চারা রোপণ :

৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা উত্তম। এ সময় প্রতিটি চারার ৫-৬ টি পাতা হয়ে থাকে। অনিবার্য কারণে বেগুনের চারা দুই মাস বয়স পর্যন্ত রোপণ করা চলে। রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে জাত ও মাটির উর্বরতার উপর। সাধারনত ৭০ সে.মি. প্রশস্ত বেড়ে এক সারিতে চারা রোপন করা হয়। দুইটি বেড়ের মাঝে ৩০ সে.মি. প্রশস্তনালা থাকে। সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭০-৮০ সে.মি. হয়ে থাকে।



চিত্র : বেড়ে এক সারিতে চারা রোপণ

সেচ ব্যবস্থা :

বেডের দুপাশের নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক। নালায় সেচের পানি বেশীক্ষণ ধরে রাখা যাবে না, গাছের গোড়া পর্যন্ত মাটি ভিজ়ে গেলে নালার পানি ছেড়ে দিতে হবে।

খরিপ মৌসুমে জমিতে পানি যাতে না জমে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের জন্য জমির চারপাশে নালা রাখতে হবে।

ফসল সংগ্রহ :

চারা লাগানোর ৫০-৬০ দিন পরই ফসল কাটার সময় হয়। ৭-১০ দিন পরপর গাছ থেকে ধারাল ছুরির সাহায্যে বেগুন কাটা ভাল।

ফলন (প্রতি হেক্টরে)

৩০-৭০ টন

পোকামাকড় বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা

বিটি বেগুন ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী।

পাতার হপার পোকা

ক্ষতির লক্ষণ :

আক্রান্ত বেগুনের পাতা কিনারা বরাবর উপরের দিকে বেকে যায়। পাতার কিনারা হলুদাভ হয়ে যায় অথবা পুড়ে যাওয়ার মত মনে হয়। পাতার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় বলে পাতা ছোট থেকে যায় এবং মোজাইক ধরনের হলুদ রং পরিলক্ষিত হয়। আক্রান্ত গাছে ফল ধরার সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে। পাতার হপার পোকা প্রকৃত পক্ষে সারাবছরই বংশ বৃদ্ধি করে থাকে তবে শুষ্ক মৌসুমে এদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই পোকা পাতার নীচের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষুদ্র নিম্ফসমূহ পাতার নীচ দিক থেকে রস চুষে খায়। এদের জীবনকাল ৫-৭ সপ্তাহ এবং একই মৌসুমে একাধিক প্রজন্ম হয়ে থাকে।

দমন ব্যবস্থাপনা :

১. প্রতিরোধী জাত যেমন, বারি বেগুন ৬ বা বিএল ১১৪ চাষ করা।
২. নিমতেল ৫ মি:লি: + ৫ গ্রাম ট্রিকস্ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নীচের দিকে স্প্রে করা।
৩. এক কেজী আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ২০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি পাতার নীচের দিকে স্প্রে করা।
৪. পাঁচ গ্রাম পরিমান গুড়া সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নীচের দিকে স্প্রে করা।
৫. আক্রমণের হার অত্যন্ত বেশী হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২মি: লি: পরিমান) স্প্রে করা অথবা এডমায়ার ১০০ এস এল (প্রতি লিটার পানিতে ০.২৫ মি: লি: পরিমান) মিশিয়ে স্প্রে করা।

ইপিল্যাকনা বিটল

ক্ষতির লক্ষণ :

এই পোকা পাতার শিরাগুলোর মাঝের অংশ খেয়ে ফেলে। মধ্য শিরা বাদে পাতার সমস্ত অংশ খেয়ে ঝাঝরা করে ফেলতে পারে এবং ফলের উপরি ভাগের কিছু অংশ খেয়ে ফেলতে পারে অথবা ছোট ছিদ্র করতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্ক ও কীড়া প্রায়শই একই সাথে দেখা যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক পোকা সাধারণ লেডি বিটল এর মত দেখা যায় কিন্তু লেডি বিটল পোকা গাছ বা গাছের পাতা খায় না। ইপিল্যাকনা বিটল ডিম্বাকার এবং পিঠে কাল ফোটা যুক্ত বাদামী রংয়ের। কীড়ার রং ফ্যাকাশে হলুদ এবং পিঠের উপরিভাগে ও পাশে শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট ছোট ছোট কাটা দ্বারা আবৃত থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী ইপিল্যাকনা বিটল বেশীর ভাগ সময়ে পাতার নীচের দিকে "সিগার" আকৃতির হলুদ রংয়ের ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কাটায়ুক্ত হলুদ কীড়া বের হয়ে পাতার নীচের অংশ খাওয়া শুরু করে। ইপিল্যাকনা বিটলের কীড়া ৪টি ধাপ অতিক্রম করে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, পূর্ণাঙ্গ কীড়া ৬ মিঃমিঃ লম্বা হয়ে থাকে। কালচে রংয়ের পিউপা সমূহ পাতা অথবা কাণ্ডে থাকতে দেখা যায়। ইপিল্যাকনা বিটলের জীবন চক্র ১৫-২০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং একই মৌসুমে কয়েক প্রজন্ম হয়ে থাকে।

দমন ব্যবস্থাপনা :

১. পোকা সহ আক্রান্ত পাতা হাত বাছাই করে মেরে ফেলা।
২. নিমতেল ৫ মি:লি: + ৫ গ্রাম ট্রিকস্ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।
৩. এক কেজী আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি স্প্রে করা।
৪. আক্রমণের হার অত্যন্ত বেশী হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২মি: লি: পরিমাণ) স্প্রে করা।

লাল মাকড়

ক্ষতির লক্ষণ :

লাল মাকড় খাওয়া বেগুনের পাতায় হলুদাভ ছোপ ছোপ দাগের সৃষ্টি হয়। যখন এই ধরনের আক্রমণ পাতার নীচে দিকে মাঝখানে বেশী হয় তখন প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাতা কুকড়ীয়ে যেতে দেখা যায়। ব্যপক আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণ পাতা হলুদ ও বাদামী রং ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত পাতা ঝরে পরে। লাল মাকড় পাতার নীচের পৃষ্ঠ-দেশে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে যা খালি চোখে দেখা যায় না। এই ডিম থেকে কমলা রংয়ের বাচ্চা বের হয়ে বেগুন পাতার নীচের পৃষ্ঠদেশে খেতে থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চাগুলো গাঢ়-কমলা বা লাল রংয়ের পূর্ণ মাকড়ে পরিণত হয় যারা দেখতে ক্ষুদ্র মাকড়সার মত। এদের পাতার নীচের পৃষ্ঠদেশে চলাফেরা করতে দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা :

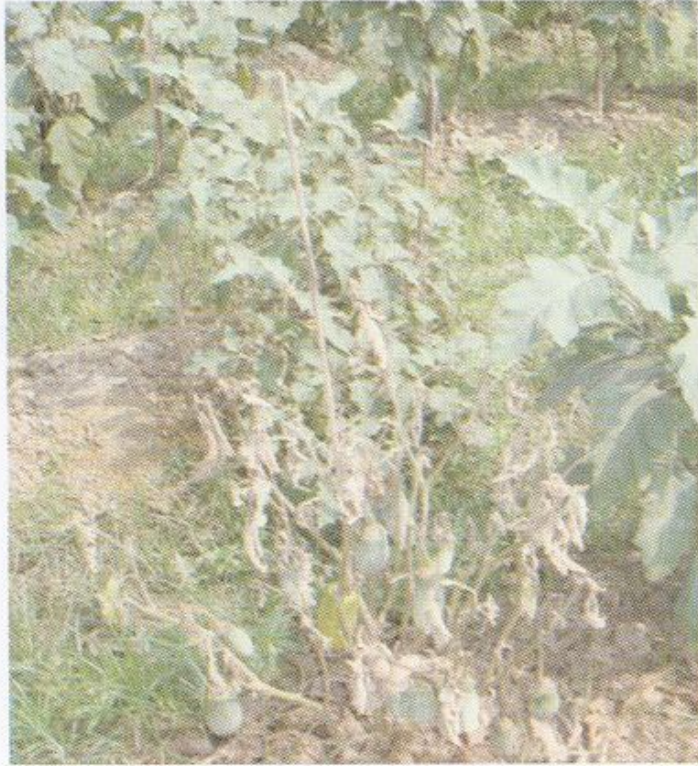
১. নিমতেল ৫ মি:লি: + ৫ গ্রাম ট্রিকস্ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নীচের দিকে স্প্রে করা।
২. এক কেজী আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি পাতার নীচের দিকে স্প্রে করা।
৩. আক্রমণ তীব্র হলে প্রতি লিটার পানির সাথে মাকড়নাশক (যেমন: ওমাইট ৫৭ তরল ১ মিলিলিটার হারে) পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করে মাকড়ের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব। মাকড়নাশক পাওয়া না গেলে সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (কুমলান্ন, ইত্যাদি) স্প্রে করে মাকড়ের আক্রমণ কমানো সম্ভব। লক্ষ্য রাখতে হবে মাকড়ের সাথে অন্য পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রথমে মাকড়নাশক ব্যবহার করে অতঃপর কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

রোগবালাই

কাভ পচা ও ফল পচা (ফমপসি)

দমন ব্যবস্থাপনা :

১. সুস্থ-রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা।
২. সেচ বা বৃষ্টির পর গাছের গোড়ার মাটি আলগা করা।
৩. প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ দিয়ে শোধন করা; ৫০ সে. তাপমাত্রার গরম পানিতে ১৫ মিনিট রেখে বীজ শোধন করা।
৪. রোগ কাণ্ডে দেখা দিলে গাছের গোড়াসহ মাটি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ব্যাভিস্টিন/নোইন গুলিয়ে ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। বীজ বেগুনে রোগ দেখামাত্র ছত্রাকনাশক স্প্রে করা।
৫. রোগ হয় এরূপ জমিতে কমপক্ষে ৩ বছর শস্য পর্যায় অনুসরণ করা।
৬. ফসল সংগ্রহের পর মুড়ি গাছ না রেখে সমস্ত গাছ, ডালপালা, পাতা ইত্যাদি একত্র করে পুড়িয়ে ফেলা।



ঢলেপড়া রোগ

দমন ব্যবস্থাপনা :

১. আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধ্বংস করা।
২. রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করা।
৩. বন বেগুন যথা টরভাম বা সিসিম্ব্রিফলিয়ামের সাথে জোড় কলম করা।

গুচ্ছপাতা

দমন ব্যবস্থাপনা :

১. আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধ্বংস করা।
২. ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার রাখা।
৩. ক্ষেতে জেসিড পোকের উপস্থিতি দেখা দিলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করে তা দমন করা।

